দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

নকল প্রবণতা কেন?

কে,এম, সোবহান

পত্রিকায় পরীক্ষা অর্থাৎ এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার খবরে হঠাৎ করে তোলপাড় হয়ে যায় শিক্ষাঙ্গন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, অভিভাবক, পরীক্ষার্থী সমাজ। তার ঢেউ লাগে সমস্ত দেশে। গত এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা, অনেক তদন্ত হলো। অবশেষে দেখা গেল প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার পরও যে সব পরীক্ষার্থী পরীক্ষার ফল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে না তাদের প্রয়োজন হয় নকল করার। নকল করার পরও যে তারা পাস করতে পারবে এ নিশ্চয়তা কেউই দিতে পারে না। নকল যা করা হয় তা যে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের সঠিক বা সম্পূর্ণ উত্তর এটা নকল যে করে তার বোঝার ক্ষমতার বাইরে। নকল করারও অভিনব পন্থা আবিষ্কৃত হচ্ছে। পরীক্ষার্থীর হয়ে প্রক্সি দেয়া পুরান হয়ে গেছে। বই-এর পাতা কেটে বা হাতে লেখা বা কম্পিউটারে লেখা এবং ফটোকপি করা নকল করার জন্য উত্তরও পুরান হয়ে গেছে। অত্যাধুনিক পন্থা হচ্ছে ট্যাবলয়েড নোট বই। ট্যাবলয়েড নোট বই শব্দটি আহরিত হলো একটি দৈনিকে এ সংক্রান্ত শিরোনাম থেকে। ট্যাবলয়েড শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো জনপ্রিয় পত্রিকা যা সাধারণ খবরের কাগজের অর্ধাকৃতিতে ছাপা হয়। সেদিক থেকে ট্যাবলয়েড নোট বই বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করল যেমন করেছিল 'মিডিয়া ক্যু' ও 'ভোট ডাকাতি'। এ ধরনের নোট বই নাকি পাঁচ ইঞ্চি চওড়া ও আট ইঞ্চি লম্বায়। ক্ষুদ্রাকৃতির কারণ বোধ হয় এই যে, সহজেই পকেটে করে এই বই বহন করা যায় এবং অনায়াসে পরীক্ষার হলে এর পূর্ণ ব্যবহার করা যায়।

এর পর আসে নকল সরবরাহকারীদের বিষয়। 'নকল সরবরাহ করার ব্যাপারে পরীক্ষার্থীকে সাহায্য করেন তার অভিভাবক, বন্ধু-বান্ধব, পেশাদারী নকল সরবরাহকারী, শিক্ষক, পুলিশ, অনেক সময় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর স্বজন যদি পরীক্ষার্থী থাকে। অর্থাৎ পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীকে নকলের জন্য উদ্বিগ্ন থাকতে হয় না। দৈনিকে লেখা হয় 'নকলের উৎসব চলছে', 'গণটোকাটুকি' হচ্ছে ইত্যাদি। এইচএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষার পর চাঁদপুর সরকারী মহিলা কলেজে ছাত্রীদের নকলে বাধা দেয়ায় পরীক্ষাশেষে তারা ভাংচুর করেছে এমনকি ইট-পাটকেলও ছোঁড়াছুঁড়ি করেছে। দেখা যাচ্ছে এসব ব্যাপারে ছাত্রীরাও পিছিয়ে নেই। কেনইবা থাকবে? ইংরাজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার দিন কুলিয়ারচর পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল ধরার জন্য পরীক্ষা কেন্দ্রে একজন ম্যাজিস্ট্রেট ছুরিকাহত হয়েছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। নকল প্রতিরোধ করতে যেয়ে মেলান্দহ সরকারী কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে দু'জন প্রভাষক প্রহৃত হয়েছেন। সাতকানিয়ায় ৪ জন পরীক্ষার্থী গুলীবিদ্ধ হয়। এসব খবর বিচ্ছিন্ন খবর নয়। সারা বাংলাদেশে এই একই চিত্র। এসএসসি বা এইচএসসি যে পরীক্ষাই হোক নকল চলছে। নকলকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী ঘটনাও ঘটছে।

নকল প্রবণতার পিছনের কারণ অনুসন্ধান করার সময় এসেছে। ঢালাওভাবে ছাত্রদের উপর বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে সমস্যা–এই গভীর সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় পলায়ন মনোবৃত্তি থেকে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না এবং বছরের পর বছর এটা চলতেই থাকবে। ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ছাত্র সংখ্যা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে নকল প্রবণতা। গণতান্ত্রিক সমাজের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষিত বলতে তাকেই বোঝায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে চলাফেরা করেছে। বাংলাদেশে শিক্ষার মান উন্নত নয়। শিক্ষার মান উন্নত না হওয়ায় ছাত্ররা এখন ঝুঁকে পড়েছে বিপুল অর্থ ব্যয় করে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ার দিকে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন ডিগ্রি দেয়া হয়। কোন কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংল্যান্ড বা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে ব্যবস্থার কারণে ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পাওয়া যায়। ঐ সব বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের ছাত্র সমাজের এক ভগ্নাংশ পড়তে পারে। কাজেই দেশের বৃহত্তর ছাত্রগোষ্ঠীর জন্য-যেসব বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেগুলোর মান উন্নয়ন করতে হবে। শিক্ষা মানের দ্রুত অবনতির ফলে বিদেশের ভাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির সমমূল্য দেয় না। এর ফলে এখানকার সর্বোচ্চ ডিগ্রিপ্রাপ্তকেও বিদেশে পড়াশোনা করার জন্য বা উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় বা নির্দিষ্ট নম্বর পেতে হয় যেটা প্রায়শঃই শক্ত হয়ে যায় সাধারণ ছাত্রদের জন্য। নকল প্রবণতা চিরকালই এদেশে আছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যদি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে, তখনও নকল হতো। তিরিশের দশকের শেষদিকে তদানীন্তন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় একজন ছাত্রের হয়ে একজন শিক্ষক পরীক্ষা দিতে যেয়ে ধরা পড়েন এবং তিনি কারাদন্ডে দন্ডিত হন। বি,এ পরীক্ষায় নকল ধরতে যেয়ে একজন গার্ড ছুরিকাহত হয়ে নিহত হন। যেটা তখন ছিল না তা হচ্ছে নকলের সামাজিক স্বীকৃতি। যে ছাত্র নকল করত তার প্রতি ঘৃণা ও করুণা মিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখত অন্য ছাত্ররা। আরও যা ছিল না তা হচ্ছে শিক্ষক, গার্ড, অভিভাবকদের নকলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা। বর্তমানে নকল একটি মহাব্যাধি হিসাবে দেখা দিয়েছে। এর কেবল সামাজিক স্বীকৃতি দেয়া হয়নি, এটা পরীক্ষার্থীদের একটি অধিকারে পরিণত হয়েছে। নকলে বাধা দিলেই হিংস্র হয়ে উঠে পরীক্ষার্থী বা তার শিক্ষক বা অভিভাবকরা। যারা নকল করে বা নকলকে প্রশ্রয় দেয় তারা এর দীর্ঘকালীন কুফলের বা অসুবিধার কথা চিন্তা করে না। এসএসসি বা এইচএসসি পাস করলে পরবর্তীতে কোন ভাল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গেলে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়। বর্তমান ব্যবস্থায় ঐসব পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা থাকলেও তার কোন সুযোগ থাকে না প্রশ্নপত্র ভিন্ন ধরনের হওয়ার ফলে। তখন সন্ধান করা হয় এমন কলেজের যেখানে ক্লাস না করেও পরীক্ষা দেয়া যায় এবং পরীক্ষায় নকল করার সুবিধা নিতে হয়। এরপর চাকরি জীবনেও ঐ নকল করার বিড়ম্বনা নানাভাবে দেখা যায়, যার ফলে কর্মজীবনেও সাফল্য আসেনি। তখন সাফল্যের বাঁকা পথ ধরতে হয়।

নকল প্রবণতা চিরকালই এদেশে আছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যদি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে, তখনও নকল হতো। তিরিশের দশকের শেষদিকে তদানীন্তন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় একজন ছাত্রের হয়ে একজন শিক্ষক পরীক্ষা দিতে যেয়ে ধরা পড়েন এবং তিনি কারাদন্ডে দন্ডিত হন। বি,এ পরীক্ষায় নকল ধরতে যেয়ে একজন গার্ড ছুরিকাহত হয়ে নিহত হন। যেটা তখন ছিল না তা হচ্ছে নকলের সামাজিক স্বীকৃতি।

যারা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত আছেন তাঁরা বিষয়টির গভীরে যেয়ে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করে সমস্যা সমাধান করতে পারবেন। সাধারণভাবে একজন অভিভাবকের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে দেখত পাওয়া যায় যে পরীক্ষার যে পাঠ্যসূচী দেয়া হয় তা কতখানি ছাত্রের জন্য প্রয়োজনীয় বা প্রয়োজনাতিরিক্ত সেদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি থাক না একজন ছাত্রের উপর পাঠ্যসূচীর যে বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয় তাই জন্ম দেয় নকল প্রবণতার। নকল প্রবণতা কেবল পাস করার জন্যই নয়। এটা ভাল কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য যে সর্বনিম্ন নম্বর দেয়া হয় তা পাওয়ার জন্যও।

যেসব স্কুল-কলেজে বৃহত্তর ছাত্র গোষ্ঠী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় সেখানে পড়ার বা পড়ানোর পরিবেশ কতখানি সুষ্ঠু? একসময়ে কলেজে পড়তে হলে শহরে আসতে হতো বা স্কুলে পড়তে হলে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হতো। বর্তমানে গ্রামপর্যায়ে একাধিক স্কুল আছে। কোন কোন জায়গায় এবং থানা পর্যায়ে একাধিক কলেজ আছে। এইসব সাধারণ গ্রাম বা থানাপর্যায়ে যেসব স্কুল-কলেজ আছে সেখানে পড়া বা পড়ানোর অবস্থা কি রকম সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন আছে। প্রায়ই শোনা যায় বোর্ডের বই সঠিক সময়ে পাওয়া যায় না। বোর্ডের বই পেতে দেরি হওয়ার কারণে পড়ার ব্যাঘাত ঘটে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা পিছিয়ে যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচীর কারণে স্কুল-কলেজে হরতাল পালিত হয়। সে কারণেও একজন ছাত্র তার পাঠ্যসূচী শেষ করতে পারবে না। আরও আছে ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক দলাদলি যার ফলেও স্কুল-কলেজ বন্ধ করতে বাধ্য হন কর্তৃপক্ষ।

স্কুল-কলেজে যেসব শিক্ষক নিযুক্তি পান তাঁরা কেবলই শিক্ষকতা বা অধ্যাপনাই করেন না তার সঙ্গে পার্শ্ব ব্যবসা বা অন্য কিছু করেন যেটা শিক্ষক বা অধ্যাপকের কাছে প্রধান আয়ের সূত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং শিক্ষকতা বা অধ্যাপনায় শিথিলতা দেখা দেয়। শিক্ষক অধ্যাপকরা প্রাইভেট পড়ানোর দিকে বেশি সময় দেন। এতে তাঁদের দক্ষতা হ্রাস পায় অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে। এ অভিযোগও অস্বীকার করা যায় না যে বর্তমানের শিক্ষক অধ্যাপকরাও ঐ নকল প্রক্রিয়ারই সৃষ্টি। সে কারণে তাদের দক্ষতা প্রশ্নাতীত নয়। তাদের অদক্ষতা ছাত্রদের ভালভাবে পড়ার অন্তরায়। এইসব বিভিন্ন কারণে এর বাইরেও আরও কারণের জন্য ছাত্রদের পরীক্ষা দেয়ার উপযুক্ত প্রস্তুতি থাকে না। অভিভাবকদের চাপ থাকে, সমাজের চাপ থাকে যথাসময় পরীক্ষা দেয়ার। পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে বসে ঠিকই কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মত প্রস্তুতি তার থাকে না। পরীক্ষার্থী তখন খোঁজে পরীক্ষা পাসের বা ভাল ফল করার সহজ পথ। স্কুলে পড়বার সময় ছাত্রের পড়ার ভিত্তিতে যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয় তাই জন্ম দেয় নকল প্রবণতাকে। যে পরীক্ষার্থী সাধারণভাবে পড়ার দিক থেকে প্রস্তুত থাকে পরীক্ষার জন্য সে নকলের আশ্রয় নেয় না। এখন গ্রাম জীবনের আধুনিক বিনোদনের হাতছানি আছে। এই ডাকে সাড়া দিতে অর্থের প্রয়োজন যা একজন অভিভাবকের পক্ষে দেয়া সম্ভব হয় না। তখন ছাত্ররা সহজভাবে অর্থ রোজগারের পথ খোঁজে। এটা স্বাভাবিকভাবেই তার পড়াশোনার অন্তরায় হয়ে যায়, ফলে তার পরীক্ষার প্রস্তুতি থাকে না।

নকল সমস্যার বিভিন্ন কারণ আছে তবে এর মূলে আছে পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় প্রস্তুতির অভাব যা পূরণ করা হয় নকল করে। পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে সংশ্লিষ্ট সকলকেই।